দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকা: রোববার, ২৪ শ্রাবণ,

10 AUG 1988

দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা

অধ্যাপক মাহবুবুল আলম

শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি বহু পুরানো রীতি হিসাবে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত। আমাদের দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিশ্বজনীন পদ্ধতি বিচিত্র ধরনের দুর্নীতির স্পর্শ লেগে কলুষিত হয়ে পড়েছে এবং পরিণামে জনগণ এই পরীক্ষা পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে পারছে না। তাই এখন মেধা পরিমাপের জন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে ঠেলে দেয়া খুব একটা উপযুক্ত পন্থা হিসাবে মনে করা হয় না। এখন পরীক্ষা একটা সার্টিফিকেট সংগ্রহের উপায় বলে বিবেচিত। সে সার্টিফিকেটের সাথে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার প্রশ্নটিকে এখন আর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নয়। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য এই কাগুজে সার্টিফিকেটটির মর্যাদা।

শিক্ষার্থীদের জীবনে পরীক্ষা পদ্ধতির এই গুরুত্ব না থাকার বিষয়টির সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরীক্ষার হলে বই দেখে বা বইয়ের ছেঁড়া পাতা দেখে, অন্য কাগজে লিখে এনে বা অন্যের খাতা দেখে অথবা বাইরে থেকে খাতা লিখে এনে উত্তরপত্র বদল করে উত্তর দেয়া পরীক্ষার প্রচলিত দুর্নীতির প্রধান নিদর্শন। এছাড়া পরীক্ষার সময় কথা বলে উত্তর লিখা, শিক্ষকের কাছ থেকে জবাব জেনে নেয়া এসবও পরীক্ষাকালীন দুর্নীতি বলে লক্ষণীয়। তবে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির সীমারেখা আরো ব্যাপক। এক সাথে পরীক্ষার হলে বসে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য পরীক্ষার ফরম এক সাথে পূরণ করা, বিশেষ সুবিধা লাভ করা যায় এমন সুনাম (?) সম্পন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর পরিবর্তন, পরীক্ষার খাতা দেখার সময় পরীক্ষক-প্রধান পরীক্ষকের খোঁজ নিয়ে নম্বর বাড়ানোর তদবির করা, টেবুলেশন কাজের সময় ফলাফল জেনে নেয়া, ফল প্রকাশের সময় ফলাফলের উন্নয়ন, টেবুলেশান বইয়ে নম্বর বাড়িয়ে নেয়া, সার্টিফিকেট জাল করা—এ ধরনের আরো অনেক উপায়ে পরীক্ষায় দুর্নীতি ঘটে থাকে। এসব উপায়ে একটিই লক্ষ্য—যে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে তার ফল ভাল হিসাবে দেখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান করা। ব্যক্তি জীবনের একটি মহৎ কাল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিলেও এর পরিণাম যে কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না এবং ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে যে তার কোনো শুভ প্রভাব পড়ে না—এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ। এমন কি যারা এই দুর্নীতির সাথে জড়িত তারাও এর অন্যায় দিকটি সম্পর্কে কোনো দ্বিমত পোষণ করে না। বরং পরীক্ষায় দুর্নীতি যে জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা ভেবে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন এবং সমাজ জীবনের অবক্ষয় রোধ করার জন্য পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার আহবান জানান। কোনো অন্যায় থেকে কল্যাণ হতে পারে এমন আশা করা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। সে জন্য সচেতনভাবে পরীক্ষায় দুর্নীতি অবলম্বন করা হলে তা কোনো কল্যাণ আনয়ন করছে না, বরং এর পরিণামের কথা ভেবে অনেক প্রচলিত পদ্ধতি সংস্কারের কথা ভেবে থাকেন।

রীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে তাতে কারো দ্বিমত নেই। এমন কি পরীক্ষায় যারা দুর্নীতির পরিচয় দেয় তারাও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষার পক্ষপাতী। দুর্নীতিবাজেরা দুর্নীতির আশ্রয় নেয় দুর্নীতি আছে বলেই। পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে পাস করব এমন আশা নিয়ে কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় না। বরং সারা বছর লেখাপড়া করে পরীক্ষায় ভাল করার জন্য সবাই সচেষ্ট থাকে। কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় দুর্নীতির সুযোগ এসে যায় তখন সে সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে অনেকেই তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকে সারা বছর লেখাপড়া না করে আর কোনো পথ না দেখে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় অথবা মজ্জাগতভাবে দুর্নীতিবাজ—এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব কম। এ ধরনের মুষ্টিমেয় দুর্নীতিবাজের সীমানা পেরিয়ে যখন ব্যাপকভাবে নকল করা শুরু হয় তখনই এর পরিণাম সম্পর্কে সবাই সচেতন হয়ে ওঠে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি যাতে না ঘটতে পারে সে সম্পর্কে প্রচুর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে এবং দুর্নীতি বন্ধ করা বা এর জন্য শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত আইনও রয়েছে। এসব আইন বিধি থাকার পরেও পরীক্ষা হলকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা যাচ্ছে না এবং ক্রম পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে একে দুর্নীতিমুক্ত রাখার কথা ভাবা হয় এবং সে কারণে যুগে যুগে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগের কোনো শেষ না থাকলেও কোনো পদ্ধতিতেই পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়নি। আসলে আইন না মানার প্রবণতা থাকলে কোনো আইনই সন্তোষজনক ফল নিয়ে আসতে পারে না। পরীক্ষার জন্য যে কোনো পদ্ধতিই আবিষ্কার করা হোক না কেন, শিক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি তা না মানে তবে তার কোনো কার্যকারিতা নেই। এক সময় প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ শিক্ষকের উপর পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু নম্বর বরাদ্দের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল; এখনো টিউটোরিয়াল ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় নিজ শিক্ষকের নম্বর দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেখানেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠে। পেশী শক্তির সাহায্যে কাজ উদ্ধার করার ক্ষেত্র শুধু পরীক্ষার হল নয়, এর বাইরেও তার সীমানা প্রসারিত। অন্যদিকে অর্থের প্রলোভনের সীমানা খুব ছোট বলে মনে করার কারণ নেই।

শিক্ষার্থী বা পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়ম-কানুন আমাদের সমাজের বাইরে নয়। সমাজের অন্যান্য জায়গায় দুর্নীতি চলবে আর পরীক্ষার্থীরা শুধু বিবেকবান হিসাবে পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করবে এমন আশা করা যথার্থ নয়। অসৎ অভিভাবকের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে যে ছেলের লেখাপড়া, সে ছেলে পরীক্ষা হলে তার দেহের রক্তে মিশে থাকা দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে তা কেমন করে আশা করা যায়। তাই আমাদের সকল আইন সকল পদ্ধতি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আমরা ক্রমেই নিরাশার মুখোমুখি হই।

পরিণামের অশুভ সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকি। পাশ কাটিয়ে গা বাঁচানোর চেষ্টা করে সবাই। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাহস নেই। ব্যক্তি চেতনার উর্ধ্বে উঠে দেশ বা জাতির জন্য কাজ করার চেষ্টা নেই। ফলে সমস্যার জটিলতা দেখে আমরা সমাধান থেকে বিমুখ হয়ে থাকি। নইলে যে শিক্ষকসমাজ ছাত্রদের জীবন গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা যদি সচেতন হন তবেই পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে। বাইরের কোনো শক্তির সহায়তা না নিয়ে শিক্ষকরাই এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য কাউকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকসমাজের দায়িত্ব এদিক থেকে সবচেয়ে বেশি এবং তাঁদের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রও যথেষ্ট অনুকূল। আইন-কানুন পদ্ধতির সংস্কার ইত্যাদি কাজ যাঁদের করার তাঁরা করবেন। কিন্তু সে সব যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকসমাজকেই তৎপর হতে হবে। তাহলে শিক্ষকগণ তাঁদের শ্রমের কল্যাণকর পরিণাম দেখতে পাবেন।

শিক্ষার্থীরা যদি মনে করে যে, কোনো কিছুই মানব না, তাহলে তাদের মানানোর কোনো শক্তি নেই। কিন্তু এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা দেখালে তা তাদের জীবনে যে কল্যাণ বয়ে আনবে না তা তারাও বুঝে। সে জন্য তারা নিজেরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে জীবনকে কলুষিত করবে না এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় তাদের মধ্যে জাগাতে হবে। এমন একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যেখানে শিক্ষার্থীরাই সিদ্ধান্ত নেবে যে, আমরা দুর্নীতির আশ্রয় নেব না। এই পরিবেশ শুধু আইন আর পদ্ধতি সংস্কারে গড়ে উঠবে না।